কবিতানির্মাণবিষয়ে কয়েক টুকরো

যশোধরা রায়চৌধুরী

জন্ম হয় কবিতার

'দ্য পিয়ানো' নামে একটি ছবি এসেছিল বেশ কিছু বছর আগে । ছবির এক দৃশ্যে এক বিস্তীর্ণ সমুদ্রতটের উপরে দাঁড়ানো একা একটি পিয়ানোকে দেখতে পাই । পিয়ানোর পা চারটে দাঁরিয়ে আছে কাঁকড়াঝিনুকময় বালির উপরে । উপরের অংশ, টেপার চাবিগুলি সমেত, প্যাকিংকাঠের বাক্সে বন্দী । ক্যামেরা এবং পিয়ানোর মালকিন, ছবির নায়িকা, দুজনেই তট ছেড়ে ক্রমশই সরে আসতে থাকে দূরে । পাকদন্ডী বেয়ে উঠতে থাকে উপরে । আর নায়িকা ও ক্যামেরার যুগ্মদৃষ্টি প্রগাঢ় মায়া ও মমতায় স্নাত করে দেয় পিয়ানোটিকে । একের পর এক আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সামনে অসহায়ভাবে সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে থাকে একা, একেবারে একা একটি পিয়ানো । ক্রমশ বেড়ে ওঠা দূরত্বের জন্য তাকে আরো ছোট, আরো একা লাগে ।

এ মুহূর্তে কেউ তার রীডের উপরে হাত রাখছে না । কিন্তু আশ্চর্যভাবে সমস্ত দৃশ্যটা ঝমঝম করে বেজে ওঠে ।

হয়ত এভাবেই জন্ম হয় কবিতার । এভাবেই হয় ।

যেভাবে নীরবতাসত্বেও আমরা পিয়ানোর বাজনা শুনে ফেলি শুধু একটি প্যাকিংবক্সে বন্দী পিয়ানোর প্রত্যাখ্যাত দৃশ্যে । এই 'সত্বেও' শব্দটি এখানে অমোঘ , কারণ এই জগতের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাসত্বেও কবিতা সম্ভব হয় । সম্ভব হয় এক ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা অন্য কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে । শ্রবণ দিয়ে বোঝা রূপকে । চক্ষু দিয়ে দেখা শব্দকে । আর ঘ্রাণ । আর স্বাদ । আর স্পর্শ । এভাবেই হয় কবিতা । হয়ে ওঠে ।

যে দৃশ্যের কথা লিখলাম, সেটা কিন্তু ছবির উন্মোচনী দৃশ্য নয় । যে দর্শকের মনে কোনো গভীর প্রত্যাশা ও কৌতূহল সৃষ্টি করার জন্য এর প্রয়োগ । এ কিন্তু ছবির সমাপ্তিদৃশ্যও নয় । যা হতেই পারত, খুব ক্লিশে ব্যবহার হলেও ।আসলে কেন যে ঠিক ছবি শুরু হবার মিনিট পনেরোর মাথায় এ দৃশ্যের মুখোমুখি হই, তা একমাত্র পরিচালকই বলতে পারেন।

যেমন, একটা শব্দের পর কেন একটা শব্দ বসানো হল, তা বলতে পারেন একমাত্র কবি ই ।
এই দৃশ্য এক মোচড় । একটা বাঁক । যার রয়েছে আগে এবং পরে । কিছু ফুরোনোর ক্লান্তি, কিছু শুরু করার দ্বিধা । আর , ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট ।

আবার এই একই দৃশ্য, এই বাঁক, এই মোচড় থেকে একটি প্রেমের স্থাপনা । এর পর আমরা তাকে দ্ব্যর্থহীন জানব । প্রেমটি জানাজানি হয়ে যাবার এই ক্ষণটা গল্পের পক্ষে ইমপর্ট্যান্ট ।

কিন্তু কী করে তা পারল . জানাজানি ঘটাতে পারল কিছুই না বলে ? সঠিক মোড়ে দাঁড় করিয়ে, সঠিক পারস্পেক্টিভটি চোখের সামনে খুলে দিল ? সোজাসুজি কিছুই স্থাপন করল না, অথচ সবকিছু বলে দিল ।

সিনেমা এটা পারে । কবিতাও এটা পারে ।

কবিতা যেহেতু সংস্থাপন । সঠিক মোড়ে দাঁড় করানো । সঠিক বাঁকে ছেড়ে যাওয়া । কম্পোজিশন, পারস্পেকটিভ । কতগুলো দৈনন্দিন ও তাড়িত , ঘষটানো, পুরনো, কালশিটে পড়া শব্দের শরীরে সংস্থান করে দেওয়া এক আচমকা শব্দ

। এক নতুন শব্দ, এক সুন্দর শব্দ । যাতে সবটা, সব মিলিয়ে, সুন্দর হয় । আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে সাজতে হয় না, সাজাতে হয় না।

এসব জরুরি, অত্যন্ত জরুরি , এবং যথেষ্ট কঠিন কাজের জন্যই জন্ম কবিতার ।

'জীবনানন্দীয় প্রভাব'

জী প্র নামক একটি বস্তুর কথা অতি ছোটবেলা থেকে, অর্থাৎ, আশির দশকে , যখন আমাদের কলেজে পড়াপড়ি চলছে, তখন থেকে শুনে আসছি । ওটা কি সত্যিই আছে , ইয়েতি বা ইউফোর মত ?

ঝরা পালকে (১৯২৮) জীবনানন্দ ছিলেন নজরুল ও সত্যেন্দ্র অনুসারী । প্রভাবান্বিত, অন্যের । ধূসর পাণ্ডুলিপিকে (১৯৩৬) বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন তাঁর প্রথম পরিণত কাব্যগ্রন্থ । ৩৭ বছর বয়স অবধি যে ব্যক্তিকে তাঁর প্রথম পরিণত কাব্যগ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করতে হয়, ৫৫ বছর বয়সে যাঁর নরজন্ম শেষ হয়, সেই অসুখী মানুষটির মৃত্যুর ৫০ বছর পরেও তিনি নাকি বাংলা কবিতার কবিদের আড়াল থেকে প্রভাবান্বিত করে রাখেন? আজগুবি গল্প ? ফুঃ!

তবে হ্যাঁ । ফরমুলাটা টুকেছিল দুজন, আর দুজনই বিপুল সফল ও জনপ্রিয় কবি !! এক , শক্তি চট্টোপাধ্যায় । লোকটা জীবনে নিজের মত করে লিখলোই না, শুদ্ধু জীবনানন্দকে কপি করে গেল । অথচ দেখো, কী পপুলার! আর দ্বিতীয় , বিনয় মজুমদার। এত মীথ মীথ করার কী আছে বাপু ? পুরো জীবনানন্দ নামিয়ে দিলে, একটু সায়েন্স আর অঙ্ক মিশিয়ে । তাতেই এত্তো নাচানাচি লাফালাফি ওকে নিয়ে । আসলে যে সেটা ছেঁড়া মশারি আর তেলচিটে বালিশের জন্য নয়, তাই বা কে বলবে?

তবে জীবনানন্দ নিজেই আবার বলেকয়ে গেছেন, যে উনি নাকি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন , আগামীর কবিরা সব ওনারই মত মুক্তক স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তে লিখবে । (আর আমরা লিখছিও তাই!) ' আজকালকার কবিরা ... কবিতার মর্মবাণী ফোটাতে গিয়ে বিশেষ সংহতির পরিচয় দিলেও, আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁরা ছন্দের প্রবহমানতাকেই ঢের বেশি পছন্দ করেন - মুক্তক পয়ার মুক্তক স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত মুক্তকেও লেখেন । '.... ' এই যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করার জন্য সর্বব্যাপী নিপীরনের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে - সেইটে কাব্যের ছন্দলোকে নিঃসংশয়ভাবে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে । কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ীমূলের নির্দেশ দান করে তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায় । '....'২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ারে কিম্বা প্রবহমানতার পংক্তিপরম্পরার ভিতর দিয়ে যেন সে পৌঁচেছে নির্মুক্ত সমুদ্রে । '

প্রবোধচন্দ্র সেন , জীবনানন্দের যে ছন্দ সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়েছে পরবর্তী সময়ে, তার মূলকে খুঁজে পেয়েছেন 'অতিমুক্তক' ছন্দে । রবীন্দ্রনাথের 'লাগামছেঁড়া' বা বলাকার 'বেড়াভাঙা' পয়ারের পরে, নজরুলের কবিতায় মুক্তক পংক্তি আরো প্রসার লাভ করে । অসমান পংক্তি , নানা মাপের পদ দিয়ে তৈরি পংক্তি, ক্রমশ প্রসরমান দীর্ঘ পংক্তি । অথচ অন্ত্যমিলের ব্যবহার । জীবনানন্দ এই অতিমুক্তককে বাক্ষালির কবিতাচেতনায় , শ্রবণে, মননে, গেঁথে দিয়েছেন । বিগত ষাট সত্তর বছরের মধ্যে এই ছন্দ বাংলা কবিতায় প্রায় বদভ্যাসের মত গেড়ে বসেছে ।

ক্ষতি অবশ্য তাতে হয় নি । বেশ ভালো ভালো কবিতাই লেখা হয়েছে বাংলায় ।
যারা বলে, জীবনানন্দ রাজনীতির কবিতা লেখেন নি , কথাটা ভুল, আসলে লিখেছেন ... ওই তো তাঁর লেখায় কী দারুণ কলকাতার গরিব লোকেদের বর্ণনা : তাঁরা একটা মৌলিক ভুল করেছেন । জীবনানন্দ রাজনীতির কবিতা লেখেন নি কিন্তু , সত্যিই । বরঞ্চ কবিতার একটা নিজস্ব রাজনীতি তৈরি করেছেন । যে সংবিধান তিনি তৈরি করেছেন, সেই সংবিধান মেনেই আজো কবিতা লেখা হচ্ছে । মানে , তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন, কাকে কাকে কবি বলা হবে । তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন, কবিতার জগতে সকলের প্রবেশাধিকার নেই । তাঁর তৈরি কবিতার বিশ্ব এটা ; মনে রাখা দরকার । আর সেকানেই আমরা পাঁচজন ঘুরছি ফিরছি । 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি ' : এটাও ঠিক করে দিয়েছেন তিনি । মানে , আসলে জীবনানন্দের প্রভাব বলে কোনো কিছু নেই, যা আছে তা জীবনানন্দের পৃথিবী, প্রবাহ, সংরক্ষিত অঞ্চল ....

এমনকি কবিতাই শুধু নয়, শিল্পকলার অন্য অন্য ক্ষেত্রেও ভদ্রলোক সাংঘাতিক এক ক্ষমতাতন্ত্র বানিয়ে বসে আছেন । বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কবি ও চলচ্চিত্রনির্মাতা । তিনি বলছেন, 'আমি ইমেজ নিয়ে কাজ করি, গণেশ হালুই-ও ইমেজ নিয়ে কাজ করেন - জীবনানন্দ ইমেজ নিয়েই কাজ করেন । ইমেজ এখানে বাস্তব থেকে লাফ দেয় । বাস্তবাতীত হয়ে যায় । 'জীবনানন্দ আমাকে তাড়িয়ে বেড়ান - হাজার হাজার রহস্যময় ইমেজের দিকে ঠেলে দেন । ' বুদ্ধদেবের কাছে 'বিড়াল'কবিতাটির গোটাটাই ফিল্মের মত ।
পূর্ণেন্দু পত্রী কবি ও চিত্রকর-চলচ্চিত্রকার । 'রূপসী বাংলার দুই কবি'-তে গভীর মনোনিবেশ নিয়ে তিনি জীবনানন্দ ও অবন ঠাকুরকে পাশাপাশি রেখে এই ইমেজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন ।
শুভাপ্রসন্ন আর এক শিল্পী । উনি লিখেছিলেন, পেঁচার ছবি অনেক এঁকেও, যখন তিনি যান জীবনানন্দের কবিতার কাছে, পড়েন - ' খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার / পুরোন প্যাঁচার ঘ্রাণ ' - তিনি বোধ করেন এই পুরনো প্যাঁচার ঘ্রাণের কাছাকাছি তিনি আজও পৌঁছতে পারেননি ।

সুতরাং জীবনানন্দীয় প্রবাহ বা স্পেস, যেভাবেই বলা যাক, সেটা আছে এবং থাকবে, এবং আমিও , কবিতা লেখার মুহূর্তে, পোস্ট জীবনানন্দ যুগের কবি বলেই , সেই ক্ষমতাতন্ত্র থেকে বেরোতে পারব না । তাই আমার নির্মাণ অনেকটাই প্রাক্ নির্দিষ্ট ।

কবিতা ও ইয়ামাহা স্কুটার সংক্রান্ত একটি বহু চর্চিত গল্প

এই গল্পটা আগে বলা হয়ে গেছে । তবু, আর একবার বলি।
প্রথমত, কবিতা প্রজাপতির মত একটি প্রাণী, যাকে সাঁড়াশি ও আঙুলের ব্যবহারে ব্যবচ্ছেদ করা, চটকাচটকি, খুঁটে খুঁটে , খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাটা এযাবৎ কারোর পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়নি । রীতিমত অশ্লীলতা হয়েছে । তাছাড়া তাতে যে সময় যায় সে সময়ে আরো দুটি কবিতা লেখা লিখতে পারলে ভালো হত ।

তবুও কবিতাকে খুলে এবং জোড়া দিয়ে বোঝার নিবিড় সন্ধানী চেষ্টায় আমাদের অন্ধ বিশ্বাস যায়না । এই বিষয়ে এক বড় কারিগরের গল্প মনে পড়ে । সেই কারিগর জন্ম ইশতক লেখাপড়া না শিখে মোটরসাইকেল ও স্কুটার শিখেছে । সে জন্মেছে ওই ওই বস্তু সারাবার এক কারখানায়, এবং আজন্ম ওই ওই করেছে । যন্ত্র শিখেছে যন্ত্র পড়েছে যন্ত্র জুড়েছে যন্ত্র বলেছে । ইয়ামাহা স্কুটারের প্রতি তার লোভ একটাই কারণে । ওটা সে ভাঙা পায়নি । ওটা সে জোড়া দেয়নি । সে তাই একটি ইয়ামাহা স্কুটার কিনেওছে । অতঃপর, না, সে তাতে চড়েনি, চালায়নি সে তাকে । শুধু প্রতিটি অংশ খুলেছে, নাটবল্টু এবং সমস্ত জোড় । খুলে খুলে এই স্কুটারটিকে পরিণত করেছে একটি যন্ত্রাংশের জাংকে । তারপর আবার জোড়া দিয়েছে । এবং আবার নির্মিত হয়েছে একটি ইয়ামাহা । এই প্রক্রিয়ায় সে কী লাভ করেছে ? লাভ করেছে আরো একটি ইয়ামাহা স্কুটার তৈরির অবিকল ছক ও সিদ্ধি।

খুলে বানানো ইয়ামাহা স্কুটারটিকে সে এবার অনায়াসেই সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে বেচে দিতে পারে । কারণ ওইরকম স্কুটার কীভাবে তৈরি হয় সেটা এখন তার জানা হয়ে গেছে । অ্যাসেমব্লির সমস্ত স্কিল তার আয়ত্তে । বাজারের স্পেয়ার পার্ট কিনে এখন সে নিজেই বানাতে পারে হুবহু আর একটি স্কুটার ...

কবিতাকে খুলে ও জোড়া দিয়ে সেভাবেই কি কবিরা আয়ত্ত করেন তাঁদের শিল্প ? হয়ত এতটাই যান্ত্রিক পদ্ধতিটি ! তবু এটাও ঠিক যে নতুন সৃষ্টির মূলে কোনো পূর্ব নির্দ্ধারিত ছক থাকে না । সেটা শিল্পের প্রতি অসম্মানজনক ।

তাহলে নির্মাণ নিয়ে কথা বলছি কী করে ?

একদিকে থাকে এই কথা ; প্রতিটি লেখা নতুন বলেই সাদা পৃষ্ঠা এত আকুল করে । কারণ একটি কবিতা কখনোই আর একটাইর মত নয় । হলে তো ইয়ামাহা স্কুটারেরই মত চকচকে ঝকঝকে কোয়ালিটি কনট্রোল করা কবিতারা সার দিয়ে বেরিয়ে আসত প্রোডাকশন লাইন থেকে , যেকোনো কবির কাছে যা হরর ফিলমের দৃশ্য ।
অন্যদিকে থাকে এই কথাগুলো: তাহলে কবিতাকে নিয়ে আমরা কথা বলি কেন , কেন কবিতার ওয়ার্কশপ করার কথা ভাবি, কেন কবিতার ইশকুল করার স্বপ্ন দেখি । কেন বড়রা বলেন ছোটদের : আরো কবিতা পড়, অন্যের কবিতা পড়, আগেকার কবিদের মন দিয়ে পড় । কেন বলি, কবিতাও আঁকা বা গান গাওয়ার মত একটা শিল্প , গ্রামারটা আগে শিখতে হবে তো ।

(কেমন সেই গ্রামার, যা মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে পাল্টে যায় ? যার জন্য একজন ভালো কবি কখনোই গঠনের দিক থেকে আর একজনের মত লেখেন না ।)

কেন আমরা হাতে সুতো বেঁধে বড় বড় কবিদের দ্বারে গিয়ে শিষ্যত্ব ভিক্ষা করি ? কবিতা যদি এমনই কিছু হয় যা শিক্ষার যোগ্য নয়, যা বলার যোগ্য নয়, যা অনির্বচনীয়, কীভাবে কবিতা লেখা হয় যা বলতে গিয়ে কেউ কোনো থই পায় না ?

আবার সেই জীবনানন্দ : 'চিন্তা ও সিদ্ধান্ত , প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে যেন । ' শিক্ষা ও নির্মাণ তবে এইরকম করেই, সৌন্দর্যের আড়াল ধরেই আসে না কি ? প্রতিটি কবিতা হয়ত অন্য কবিতার থেকে পৃথক , কিন্তু একটা কোথাও কোনো সূত্র নিশ্চয়ই আছে, যা আমাদের বলে দেবে, যে এটা কবিতা, আর ওটা কবিতা নয় ... আর ওয়ার্কশপ যদি আমরা করি, সেটাও তো এটাই বোঝবার জন্য যে কোন্ সামগ্রিক সৌন্দর্য পেলে তবে নিতান্ত নিরীহ কিছু শব্দগুচ্ছ হয়ে ওঠে কবিতা পদবাচ্য ? কী সেই লুকনো ভূত , যা সামান্য কিছু বাক্যকে সংস্থানের বলে করে তোলে অসামান্য ? যদি দুতিনটি বাক্যের নিজেদের ভেতরেই থাকত সেই অমোঘতা , তাহলে তো যেমন তেমন করে তাদের বললেও কবিতা অক্ষুণ্ন থাকত । তা তো থাকে না । তার জন্য কি তবে সংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ? কোথায় কে বসছে এবং বসছে না ... সেটা ... গুরুত্বপূর্ণ ।

বৈপরীত্যবিষয়ক মতবাদ

'হবিষ্য রান্নার ঘরে /ইলিশভাজার গন্ধ ভেসে আসে ' । উৎপলকুমার বসুর এই লাইনটি কেন কবিতা ? অথবা,
'শোকের আবহ থেকে আনন্দসরণই যেতে বড়জোর দশকুড়ি মিনিট ' : সুদীপ্ত মাজির এই লাইনটি ?

এক্ষুণি যে বলছিলাম নিছক যেকোনো বাক্যই কবিতা হতে পারেনা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংস্থানই তাদের কবিতা করে তোলে, সেটা কি তবে ভুল ? কারণ, ওপরের ওই দুটি লাইন তো কোনোভাবেই তাদের আগের ও পরের লাইনদের দ্বারা পরিচালিত বা প্রভাবিত নয় ? যদি হত, তবে পুরো কবিতাটি না পড়ে ওই দুটি লাইন কে ভাবতেই পারতাম না আমরা । বুঝতেই পারতাম না । অথচ, বুঝতে পারছি তো ! আর এও বুঝতে পারছি যে দুটি লাইনের ভেতরেই গাঢ় ঘুমে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে কবিতার নিজস্ব সর্পিল অস্তিত্ব । কী সেই সূত্র যা এভাবে সম্ভাবনাময় কুন্ডলীতে শায়িত থাকে আপাতনিরীহ শব্দাবলীর ভেতরে ?

এই মুহূর্তে দুটি লাইনের ভেতরেই খুঁজে পেয়ে যাচ্ছি একটি বৈশিষ্ট্য : হয়ত যা বহু সার্থক কবিতারই । বৈপরীত্য । আদম ঈবের মত, ঈশ্বর ও শয়তানের মত, আদিম এক ভালোলাগা আছে দুটি পরস্পরবিরোধী ঘটনাকে একসাথে আনার এই ক্রিয়াটিতে । 'হবিষ্যির' সাথে ইলিশ মাছের জুটি । শোকের সাথে আনন্দের জুটি । যা একই সাথে অতিশয় , ও হাস্য উদ্রেককারীও কখনো কখনো । তাই স্তম্ভিত করে ,স্পৃষ্ট করে ।
ধরা যাক ফোটোগ্রাফি । একটি অসামান্য ছবি মনে পড়ে, যাতে দেখেছিলাম, খোলা মাঠে , কোনো এক অনুষ্ঠানের শেষে অসংখ্য ফাঁকা চেয়ার ছড়ানো রয়েছে , শুধু একটি চেয়ারে একজন বৃদ্ধ তাঁর লাঠির উপরে মাথা রেখে বসে আছেন। ছবিটি এক মুহূর্তে সেই শিল্প শিখর স্পর্শ করে, যাকে আমরা সচরাচর বলে থাকি : কবিতার মত । এখানেও তো বৈপরীত্যেরই এক ক্রীড়া ঘটে গেছে : একা মানুষ ও অনেক ফাঁকা চেয়ারের বিপ্রতীপ অবস্থানে তৈরি হয়ে উঠেছে কবিতা ।
বেদনাঘন, স্পর্শকারী , প্রায় হৃদয়বিদারক এক কবিতা ।

'বন্ধ মেশিনারি , তার ফুটো করোগেটেড, তবু তারও গেটে
রাধাকৃষ্ণচূড়াগাছে অপূর্ব সিমফনি '
সুদীপ্ত মাজির লাইন । তবু-র ব্যবহার যে কী অবধারিত ভাবে কবিতা ঘটায়, তা অনুভব করে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়েছি । নিজের কবিতায় বারে বারে শেষ লাইনে তবু-র ফর্মুলা ঘটানো আমি, এখন চোখ তাকিয়ে খুঁজে দেখি , অর্ধেক

জীবনানন্দ তবু-শীল, কী ভীষণ তবু-মাত্রিক । তবু, আর তো, এই দুইয়েই মেরে রেখেছেন তিনি । ‘ তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে / আমরা কি তিমিরবিলাসী ? আমরা তো তিমিরবিনাশী হতে চাই/আমরা তো তিমিরবিনাশী ।‘

‘তোমার এক হাতে অসুখ , আর এক হাতে বিশল্যকরণী‘ কবিরুল ইসলাম লিখেছিলেন। বাক্যটি অমোঘ, এবং পাঠক, লক্ষ্য করুন, এখানেও কবিতা রস সৃষ্টি করছে বৈপরীত্যের এক লীলা।

উল্লম্ফনশীলতাবিষয়ক মতবাদ

ওই লাইনটির অনন্ত সম্ভাবনাময় বৈপরিত্যকেই হঠাৎ এক উল্লম্ফনে সটান কবিতার আরো উঁচু এক শিখরে পৌঁছে দেন কবি শেষ লাইনে ।
‘তুমিই অসুখ, তুমি বিশল্যকরণী ।‘

এই উল্লম্ফনশীলতাও তাহলে কবিতার এক অস্ত্র । যৌক্তিক প্রক্রিয়াকে তছনছ করে কবি যা তৈরি করেন তা আরো বড় এক যুক্তি ।

‘সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংসরন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে ।‘

ফুল ও মাংসের বৈপরিত্যেই শুধু ক্ষান্ত হননি এখানে বিনয় মজুমদার । যুক্তি শৃঙ্খলকে আপাতভাবে বজায় রেখেই আসলে ভাঙচুর করেছেন যৌক্তিক সব পার্থিব বলয় । অপার্থিব এক পরিশীলিত , উন্নততর যুক্তি-কূট তৈরি হয়েছে ।

‘প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে , তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্কস্থাপন করা যায় না এখনো । ‘

বিনয় বারবারই আমাদের স্তম্ভিত করেন এই উল্লম্ফনক্ষমতায়, বৈপরিত্যে । অপ্রত্যাশিতের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন ।

‘দেওয়ালের গায়ে আমি শ্যাওলা হয়ে থাকি বহুকাল /
আমাকে পিছল ভেবে সতর্ক থেকেছে পাঠকেরা ।‘

বিভাস রায়চৌধুরীর এই কবিতাংশও কিছু কম যায় না , পাঠককে অতর্কিতে আক্রমণ করতে । আবীর সিংহ যখন লিখেছিলেন, ‘কোনো জাহাজই ডোবে না, আত্মহত্যা করে ‘ বা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ‘আমার সুসময় দুঃসময় দুটোই অল্প/ রেলগাড়ির ব্রিজ আর কতটুকু? আমি সেই ব্রিজের মতন/ অল্পসল্প হাহাকার ‘ : তখন এই লাফিয়ে চলা পাগল কবিকেই আমাদের যাদুকরের মত আমোঘ ও বিস্ময়কর মনে হয়েছিল ।

কবির দেখা কীভাবেই না সরে সরে যায়। আর বিশেষ্য বিশেষণ হয়ে যায়, গুণ গুণী হয়ে যায় । আর সৃষ্টি হয় এক অসামান্য মিথ্যার জগৎ ।

মিথ্যাবিষয়ক মতবাদ

একরকমের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভুল, একরকমের মোহময় ভ্রান্তিই কবির দেখাকে করে তোলে বৈজ্ঞানিকের দেখার থেকেও বেশি দেখা । বৈজ্ঞানিক যা দেখেন সব সত্যি । কিছুটা হয়তো সত্য-হলেও-হতে-পারে কল্পনা । কবি সত্যিকে দেখেও দেখতে পান না, মোহ আবরণে ঢাকা তাঁর চোখ । তিনি মিথ্যা বলেন তাই । নিপাট মিথ্যা । আর সেই মিথ্যাজনিত কারণেই কবি সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব বুদ্বুদজগৎ । অন্ধ জগৎ । যেখানে অন্তর্লীন সামঞ্জস্য থাকে তাঁর সেই ভুল দেখাগুলোর মধ্যেই, আবার! পরিপূর্ণভাবে সম্ভাব্য, সুসমঞ্জস, কোহেরেন্ট সেই আত্মরতিময় জগতে কবি তোফা থাকেন । আর তাই সত্যের মত নয় আর, কবি যা বলেন, সেটাই সত্য হয়ে ওঠে । সেখানেই তিনি সর্বাধক্ষ্য । রাজা । নিজের নিয়মে নিজের বাস্তব বানিয়ে তোলার এই এক ক্ষমতাতন্ত্র তাঁর , কবির ।

‘ভুল ভাঙিয়ে নাও :
এসব কবিতা-লাইন আমি কিছু লিখি-টিখি নি
কোনোদিন একটা সারস অথবা বৃষ্টি
কোনোদিন স্পন্দিত পপলার
যদিও এত প্রিয় ছায়া ওদের একটু আলো-ও দেয়নি

সব থেকে খারাপ ব্যাপার
এখানে কেউ থাকে না
কাছে বা দূরে।‘

অথবা,

‘এই রাত্তিরে,
এই রাত্তিরের এই মুহূর্তে,
মনে হচ্ছে, দৈবী আগুনে হোক না সব ছারখার
তবুও পড়ে থাকবে জ্বলন্ত এক ছাই
রহস্যের আড়ালে সে বানাবে গোলাপবন ।

এইসব কথা তবু আমি ভাবিও নি বলিও নি
ভেবেছে এ-শীত রাত্তির,
ভেবেছে এ মুহূর্ত বিগত এই শীত রাত্তিরের।‘

ফরাসি কবি ফিলিপ জাকোতে ২০০৩ সালেও তাহলে নির্মাণ করতে পারেন সময়হীন এক সময়কে ? অর্থাৎ, ভাষা বহির্ভূত, দেশ ও কালবহির্ভূতও এমন কিছু কিছু জিনিশ হয় তাহলে কবিতা নামে ? যাকে চিনে নেওয়া যায় কবিতা বলেই ? যেরকম অনায়াস মিথ্যেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভাবেন সাদা পৃষ্ঠার সাথেই সঙ্গমের কথা , শক্তি ভাবেন তিনি হেমন্তের অরণ্যে পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছেন অনেক, আর জয় গোস্বামী বলতে পারেন , ‘ হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দাজলে / অতল , তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে ‘....
এই মিথ্যার জগৎকে এতটাই সত্য মনে হয়, যে মনে হয়, তার মধ্যে ঢুকেও পড়া যায় । যদিও চাবি ? চাবি কোথায় ? চাবি, সে-দরজার, সে চাবিটিও কবি রেখে দিয়েছেন তাঁর কবিতারই মধ্যে, খুঁজে নিন ....

অন্ধকারবিষয়ক মতবাদ

আর এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করে চিরদিন মথিত হয়ে এসেছি আমি । কবিতায় অন্ধকারের উপস্থিতি । তমা, যা আমাদের অস্তিত্বের অন্যতম উপাদান । রাত্রি , যা আমাদের জীবনের প্রিয়তম অর্ধ অংশ । কালো, া আমাদের প্রিয়তম বর্ণ । আর অন্ধকারের সেই বর্ণমালায় আমরা কবিদের দেখি চলাফেরা করতে কত আনায়াস বিড়ালদক্ষতায় ।

কখনো কখনো কবিতায় একেবারে নিখাদ অন্ধকারের নির্যাস উঠে আসে । যেমন সুজিত সরকারের হাইকু-প্রতিম এই লাইনগুলি:

অন্ধকারে
সত্য হয়ে ওঠে নক্ষত্র , পৃথিবী
ঘর মিথ্যা হয়ে যায়
সুজিত সরকার এইরকম সহজেই বলে দেন অন্ধকারের পরম্পরা ।

মন্দিরে যাই না, ছাদে যাই
অন্ধকার ছাদ

ওপরে আকাশ তারাভরা, নিচে নিদ্রিত সংসার

বাড়িতেই আছি, আবার বিশ্বেও আছি ....

কবিযশোপ্রার্থী আমরা, যদি ওয়ার্কশপে যাই কবিতা লেখার , একটি চ্যাপ্টার থাকবে অন্ধকার বিষয়ক । ওই চ্যাপটারের প্র্যাকটিক্যালটা হবে এইরকম : যে কোনো কবির কবিতার বই খুলুন এবং অন্ধকারের অনুষঙ্গ বার করুন । টুকে রাখুন । পড়ুন । পড়ান ।

খুব সহজ এই এক্সারসাইজ । ছোটবেলায় অনেক করেছি । সবচেয়ে আলোকিত এক কবিকে নিন প্রথমে । যথা , রবি ঠাকুর । খুলুন । গীতবিতান, হ্যাঁ, গীতবিতানই খুলুন । এই তো , আপনার প্রিয় গানের মধ্যে অনেকগুলিই সোজাসুজিভাবেই অন্ধকার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীর প্যাশনের ইঙ্গিতবাহী :
ও আমার আঁধার ভালো ...
আমি এলেম তারি দ্বারে / ডাক দিলেম অন্ধকারে ...
নিদ্রাহারা রাতের এ গান ...
দীপ নিভে গেছে মম নিশীথ সমীরে ...

চলবে না ? বেশি সোজা ? আর একটু ডিফিউজড অন্ধকার চাই ? বেশ , আবার খুলুন । বর্ষা , প্রকৃতি পর্যায় । ‘আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে / গোপন তব চরণ ফেলে / নিশার মত নীরব ওহে / সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ‘ .... ‘আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণ রাতি ‘....

ও আচ্ছা । রবীন্দ্রনাথ পছন্দ নয় ? পরবর্তী ধরি ? কী বললেন ? জীবনানন্দ ধরা চলবে না ? সবটাই অন্ধকার ? সবটাই তিমিরবিলাসী ? কোয়েশ্চেন কমন এসে গেলে আর কী করতে পারি বলুন ? আচ্ছা, নজরুল ধরি ? গানের বইটা নামালেন ? কী খুলল ? শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা? ধ্যাস, ওটা তো ভক্তিগীতি । কিন্তু ওই লাইনটা? ‘ সন্তানে দিতে কোল / ছাড়ি সুখকৈলাস/ বরাভয় রূপে মা শ্মশানে করেন বাস / কী ভয় শ্মশানে / শান্তিতে যেখানে / ঘুমাবি জননীর স্নেহ আঁচলে ?‘ কীরকম যেন গায়ে কাঁটা দেওয়া ব্যাপার.... ভক্তির কোন গদগদ উন্মাদনা নেই, আছে কালো এক জননীর বুকে শান্ত অন্ধকার মৃত্যুযাপনেরই আশ্বাস !

ওটাও চলবে না ? তাহলে মোর রিসেন্টে আসুন । দুম করে মাঝামাঝি থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাসমগ্র (১ম) খুলে ফেলুন । ১০৫ পৃষ্ঠা খুলল ? তাই সই । কী পেলেন ?

‘স্বপ্নে ভুল দেখা হল, তবু এ অন্ধকারে
জেগে ও ঘুমোতে ভালো লাগে ‘

না, খেলাটা আদৌ মন্দ নয় । কিন্তু বেশি খেললে যাকে বলবেন সে বিশ্বাসই করবে না , যে বারে বারে একই ঘটনা ঘটে যাবে । শক্তির শ্রেষ্ঠ কবিতা খুলুন । প্রথমেই খুলল ৯৫ পৃষ্ঠা । পেলেন ‘আজ সকলই কিংবদন্তী ‘। সভয়ে দেখলেন , প্রথম চার লাইনে কিংবদন্তী (প্রাচীনতা, ইতিহাস, অন্ধকার), পাতাল (নিষিদ্ধতা?), সন্ধ্যেবেলা (মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন , কবিদের প্রিয়তম সময় ?), সর্বনাশের স্বপ্নে মেশা আঁধার করা বিষের হাঁড়ি । কবিরা, একেবারে যাচ্ছেতাই মশাই!

খুলেই না হয় দেখুন শঙ্খ ঘোষ, আর এক তথাকথিত আলোকময় কবির এই সেদিনের ‘সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি‘। এই তো পাচ্ছেন :
‘এই রাত্রি স্বচ্ছতার । বহুদিন থেকে ঢেকে রাখা
এই কথা আমাদের - এইসব নীলাঞ্জন কথা ।‘

পাচ্ছেন :

‘রাত্রি এখনও সেই একইমত রাত থাকে ‘

অথবা

‘অমা এ রাতের মাঝখানে এক সরুপথ
আঁকাবাঁকা হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে বহুদূর
ক্ষতের চিহ্ন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠিক সেখানেই
খুঁজতে গিয়েছি তোমাকে, তোমার অশরীর ‘ !

অন্ধকারের রহস্যময়তা , কূট, মিষ্টিক ইত্যাদি বাংলা অনার্স প্রথম পত্র মার্কা শব্দচয় ব্যবহার করার লোভ সামলানো এখানে কঠিন । অন্ধকারের আদিমতা, সৌন্দর্য , মৌলিক আবেদন , এসবের গালভরা উল্লেখ না করেও অবশ্য বলে দেওয়া যায়, কবিতা হল অন্ধকারময়তা । শব্দের সাহায্যে এক অন্ধকারকে সাধিত করার চেষ্টা । রীডসায়েবের ভাষায়, ‘the poetry remains in the obsccurty , poetry is , in some way, the obscurity itself " এই অবস্কিউরিটি শব্দটির ‘অস্পষ্টতা‘ ছাড়াও অন্য অর্থ ‘অন্ধকারই‘ তো, কারণ ফরাসি ভাষায় ‘ অবস্কুরিতে ‘ কথাটা অন্ধকারেরই প্রতিশব্দ ।

এই অন্ধকার হয়ত যুক্ত রাখে মানুষকে তার জন্মের সাথে :

‘প্রথমে বেরিয়ে এলো কাঁচা উল রক্তের মতন/গভীর, আঁধার গর্ভ থেকে । তারপর কোহীনূর ..‘ , মল্লিকা সেনগুপ্ত সন্তানজন্ম বর্ণনা করেন এভাবেই ।অথবা :

‘ যে আছে সে সরোবরে কুন্ডলী পাকিয়ে
থাকে বাবা ও মায়ের ঠিক মাঝখানে
জলে ঘন অন্ধকার, তাও নড়ে ওঠে
আকাঙ্ক্ষাজলের সেই অলৌকিক মাছ ‘

কাচিজাতকের জন্মে এমনই বর্ণনা মল্লিকার ।

মৌলিক , প্রগাঢ় ও আদি এই অন্ধকার সর্বাঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করে আর এক আন্ধকারাচ্ছন্ন কবি জয় গোস্বামীর কবিতাও । পর পর এ কবির বইয়ের নামগুলোই যদি সাজিয়ে দিই, তা হয়ে যায় অন্ধকারের এক মুখাবয়ব । উন্মাদের পাঠক্রমও তো হয়ে ওঠে তা । সারাগায়ে সূর্য পোড়া ছাই মেখে , সে শ্মশানে জেগে বসে থাকা অন্য অন্য সব মায়েদের গল্প বলে ।

শব্দের নিজের তমা, কবিদের , আশীর্বাদধন্য কবিদের , ঘাড় ধরে নিয়ে যায় নিজস্ব ধ্বংসের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে ।

তথাচ প্রশ্ন ওঠে : সমাজবিষয়ক ?

কিন্তু অন্ধকার নামক এই বিপুলতাকেই যদি কবিতার প্রাণবস্তু ভাবি, একটা সমস্যা রয়ে যায় কোথায় যেন ।
‘ক্ষুধার্ত জীবনের কথা ‘কে বলবে তাহলে ... যদি কবিরাই না বলেন ? কে বলবে সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি বাস্তবতার কথা ? মিথ্যা-বৈপরীত্য-উল্লম্ফন-অন্ধকারের গজদন্তশীর্ষে কবিরা যদি বসে থাকেন নির্মাণদক্ষ হয়ে ?

যদি বলি নির্মাণের সাথে কোনো বিরোধিতা নেই বস্তুর, উপাদানের, কনটেন্টের ? আরো বিতর্ক উঠবে । সমাজসচেতন কনটেন্ট কি আদৌ বাইরে থেকে ঠুশে দেওয়া যায় কবিতার ওই নির্মিত শরীরে ? নাকি, ওইসব সমাজ -ফমাজ পুরলেই কবিতা আর কবিতাই থাকে না , পোস্টার হয়ে যায় । দুরকম বলার লোকই আছে ।

সম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এই যে কবিরা মথিত হন, উচ্চকিত হন, আর্তনাদ করেন, এগুলো কি সত্যিই আপনার ওই নির্মাণ তত্বের সাথে ফিট খায়, মশাই ? এই যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আদি রাজনৈতিক কবিদের কথা

আপনি উল্লেখমাত্র করছেন না - এর মানে কি তবে এই নয় যে , সমাজবাস্তবতার কথা যাঁরা লেখেন, সত্যিটাকে সত্যি করেই যাঁরা লেখেন (সত্যিটাকে সত্যি করে ? তাহলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন লিখেছিলেন 'সাঁকোর উপর দিয়ে অন্ধকারটাকে নাচাতে নাচাতে /এই মাত্র চলে গেল আরো একটা দিন ? ') - তাঁদের কবিতার ব্যাপারে আপনার ওই থিওরিগুলো খাটে না ?

উত্তরে বলি , এসব প্রশ্নকে মনের কোণেও ঠাঁই দেবেন না মশাই ! একটা গদ্যাংশ শোনাই এবার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ই এক কবিতা সম্বন্ধে, একটু এডিট করে :

" 'ভূবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে ...

সে সময়ে আমি একা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ -মর্ত্য - পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায় '

"..... এমনি এক ঘুমের এই কবিতা, এক অবচেতনের , যে অবচেতন থেকে জেগে ওঠে প্রবহমান মহাসৃষ্টির সঙ্গে নিজের লীনতার মুহূর্তজাত এক প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা । অবিস্মরণীয় এক কবিতার মুহূর্ত ।

"..... কিন্তু আমরা, যাঁরা অনেকদিন ধরে তাঁর কবিতা পড়ছি , আমাদের তখন অন্য একটা ভাবনাও এসে পড়ে মনে । অনেকদিন আগে যখন তিনি জেগে উঠেছিলেন যেন জীবনানন্দের ভূমি থেকে , তার চেয়ে এখনকার জগৎ কি তবে সরে এসেছে একেবারে? ...আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অভ্যাসে তিনি অল্পে অল্পে - কিংবা হঠাৎই একদিন - একেবারে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন সেই আবহ থেকে , মৃত্যুর আগে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন ক্ষুধার্ত জীবনের দিকে । এটা হতেই পারে যে তাঁর কবিতা এখন আর আলোছায়ার কোনো প্রদোষ রাখবে না কবিতায় , হয়ে উঠবে স্পষ্ট এবং রূঢ় , সাময়িকতার প্রয়োজনে অত্যন্ত নির্মমরূপে বাস্তবিক - ঘোষিত এবং দলীয় ।

"তবু এইটেই কি তাঁর সব পরিচয় ? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা লক্ষ্য করে পড়লে দেখা যাবে যে তাঁর এই মুহূর্তের রচনায় বিষাক্ত ধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে এক প্রগাঢ় কোমলতা ।

"... যেমন আমাদের অভিজ্ঞতারও আছে দিন আর রাত্রি , যেমন দিনের অনেক রৌরব আমরা মুছে নিই রাত্রিবেলার নির্জন আত্মক্ষালনে , বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিণত কবিতাতেও তেমনি আমরা দেখতে পাব সেই দুই ছায়াপাত । সামাজিক যে কোনো ঢেউয়ের আঘাতে কেঁপে ওঠেন এই কবি ... কিন্তু এইসব ভয়ংকর মুহূর্তেও তিনি হঠাৎ এক একবার এসে দাঁড়াতে পারেন সেই ঘুমন্ত সীমায় । .... এই হল তাঁর কবিতার রাত্রি , এইই তাঁর কবিতার আত্মস্থ অবকাশ , এইখানে তাঁর কবিতার পলিমাটি । ..."

কবিতাদীক্ষিত পাঠক , আশা করি বলে দিতে হবে না, শঙ্খ ঘোষের এই রচনা থেকেই আমি , আমরা - সংগ্রহ করে নিচ্ছি কবিতা নির্মাণে অন্ধকার উপাদানের প্রতি দায়বদ্ধতার, গভীর অন্বয়ের , সমর্থন । আর জুটে যাচ্ছে ছাড়পত্র , কবিতাকে মৃত্যু আর রাত্রির সঙ্গে মিলিয়ে রচনা করার ।

উপসংহার বিষয়ক

উপরে কথিত সকল মতবাদ এই লেখকের নিজস্ব । এবং নিজ আবিষ্কৃত ফর্মুলা অনুসারে এই লেখক প্রায়শই ইয়ামাহা স্কুটারের ন্যায় কবিতা প্রণয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন । যদি কোনো উৎসাহী ব্যক্তি, কবিযশোপ্রার্থী বা তরুণ

শব্দশিল্পী উপরোক্ত ফরমুলা মতে কবিতা ম্যানুফ্যাকচার ও সাপ্লাই করিতে ইচ্ছুক হন, লেখকের সহিত সত্বর যোগাযোগ করুন । কমিশন সাড়ে তেরো পারসেন্ট ।